ISSN-2074-8663
ইতিহাস প্রবন্ধমালা
বর্ষ ২১, সংখ্যা ১৯, ফেব্রুয়ারি ২০২৪

কিশোর বিপ্লবী আনোয়ার হোসেন

ইদ্রিস আলী*

সার-সংক্ষেপ: সাতক্ষীরা জেলার বুধহাটার হাবাশপুরের জন্ম নিয়েছিল কিশোর বিপ্লবী আনোয়ার হোসেন। প্রখর মেধাবী আনোয়ার অতি অল্প বয়স থেকেই নিজেকে অপরের কল্যাণে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। আনোয়ার হোসেন ছাত্র জীবনেই মার্ক্সবাদী ছাত্র সংগঠন ছাত্র ফেডারেশনের আদর্শের দিকে ঝুঁকে পড়েন। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে খুলনা অঞ্চলে চল্লিশের দশকের শেষ দিকে বামপন্থী নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে সংঘটিত জনকল্যাণমুখী বিভিন্ন উদ্যোগ ও কৃষকদের স্বার্থসুরক্ষাধর্মী আন্দোলনে এক অক্লান্তপ্রাণ কর্মী ছিল আনোয়ার। ১৯৪৭ এ দেশভাগের পর ভাষাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট আন্দোলনে খুলনাতে সামনের সারিতে ছিল আনোয়ার হোসেন। এসময় আন্দোলনকারী অন্য কয়েকজন নেতার সাথে আনোয়ার হোসেন গ্রেফতার হলেও দ্রুত মুক্তি পান। পরবর্তীতে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে পূণরায় গ্রেফতার হয়ে রাজশাহী জেলে স্থানান্তরিত করা হয় তাকে। রাজশাহী জেলের খাপড়াওয়ার্ডে কারারক্ষীদের গুলিতেই প্রাণ হারান আনোয়ার হোসেন।

সূচক-শব্দ: ছাত্র ফেডারেশন, খাপড়াওয়ার্ড, ভাষা আন্দোলন, অনশন, রাজবন্দী।

বিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন তথা স্বদেশের মুক্তি আন্দোলনে ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের মত যে সব অল্পবয়সী কিশোর-তরুণরা নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিল তেমনই একজন আত্মত্যাগী কিশোর বিপ্লবী ছিল আনোয়ার হোসেন। গরীব বিধবা ও বাকপ্রতিবন্ধী মায়ের একজন মেধাবী সন্তান নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পরিবর্তে নিপীড়িত মানুষের মুক্তি আন্দোলনে সামিল হন। বিট্রিশ বিরোধী বিভিন্ন আন্দোলন থেকে শুরু করে গরীব মেহনতী মানুষের সুখ-দুঃখ সমানতালে ব্যথিত করত আনোয়ার হোসেনকে। প্রখর মেধাবী ও প্রবল জাতীয়তাবাদে উদ্দীপ্ত এই তরুণ কিভাবে একজন গ্রাম্য বালক থেকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সংগ্রামের প্রেরণা হয়ে উঠছিল তা তুলে ধরাই আমার প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

প্রকাশনা পর্যালোচনা: সত্যেন সেন রচিত *গ্রাম বাংলার পথে পথে* গ্রন্থটি ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ববানী প্রকাশনী, কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। ১২৪ পৃষ্ঠার এ বইটি মূলত সত্যেন সেনের বাস্তব জীবনের ঘটনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই বইয়ের ৬৯ ও ৭০ পৃষ্ঠায় তিনি খাপড়াওয়ার্ডে শহিদ কম্পরাম সিংহ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তখনকার দিনে রাজশাহী জেলে ঘটে যাওয়া নির্বিচার হত্যাকান্ডের কথা বলেছেন।

---

*প্রভাষক, ইতিহাস বিভাগ, সাতক্ষীরা সরকারি কলেজ, সাতক্ষীরা, বাংলাদেশ।

CamScanner

লেখক মূলত খাপড়াওয়ার্ডের লোমহর্ষক ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন যেখানে সাতজন শহিদের নাম হিসাবে আনোয়ার হোসেনের নাম এসেছে।[১] সত্যেন সেন লিখেছেন: "রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলের খাপড়াওয়ার্ড সাতজন শহিদের স্মৃতি বহন করছে। কম্পরাম সিং সেই সাতজনের একজন। এদিন অন্য যারা শহিদ হয়েছিলেন তারা হল: দেলওয়ার, বিজয় সেন, আনোয়ার, সুধীন ধর, সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য ও হানিফ।" পূর্ব বাংলায় ভাষা আন্দোলন নিয়ে যারা গবেষণা করছেন তাদের মধ্যে বদরুদ্দিন উমরের কাজ এমন বিস্তৃত যার কাছে কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাজ ম্রিয়মান হতে বাধ্য। ভাষা আন্দোলনের উপর বদরুদ্দিন উমরের যে মৌলিক কাজ সেটা হল তার রচিত *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি* গ্রন্থখানি। ৩টি খন্ডে বিভক্ত এই বইটির প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড যথাক্রমে ১৯৭০ ও ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং ৩য় খন্ড প্রকাশিত হয় ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামের বইঘর থেকে। ১ম খন্ডে দশটি অধ্যায় ও একটি পরিশিষ্ট রয়েছে। ভাষা আন্দোলন পূর্ব বিভিন্ন সংগঠনের উদ্ভব, ভাষা আন্দোলনের অগ্রগতি, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের উত্থান, আরবী হরফ প্রবর্তনের ষড়যন্ত্র, পূর্ব বাংলার ভাষা কমিটি, ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস ও তৎপরবর্তী ঘটনা ১ম খন্ডে উঠে এসেছে বিস্তারিত পরিসরে। ১ম খন্ডের দশম পরিচ্ছেদে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে গুলি ও রাজবন্দীদের মধ্যে নৃশংস হত্যাকান্ডের বর্ণনা উঠে আসে সবিস্তরে। যেখানে আনোয়ার হোসেনের শহিদ হওয়ার বর্ণনা এসেছে এভাবে যে, "গুলিতে প্রথমেই মারা যান হানিফ শেখ। তারপর আনোয়ার হোসেন, মাথায় গুলি লেগে তার মাথাটা সম্পূর্ণ ভাবে চুরমার হয়ে যায়।"[২]

২য় খন্ডে পূর্ব বাংলার দুর্ভিক্ষ, কৃষক আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সরকারি নির্যাতন ও প্রতিরোধ এবং শাসনতান্ত্রিক মূলনীতি প্রস্তাব বিরোধী আন্দোলন সংক্রান্ত আলোচনা এসেছে। ২য় খন্ডের ৩য় পরিচ্ছেদে পূর্ব বাংলায় কৃষক আন্দোলনের প্রসঙ্গে খুলনার যে সকল অঞ্চলে (১৯৪৮-৫০) কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে কৃষক আন্দোলন হয়েছিল সেগুলো তুলে ধরেছেন। যার মধ্যে শোভনা, ধানবুনিয়া, কালশিরা, মৌভাগ, ঘাটভোগ, ডোবা, চিতলমারী মোল্লাহাট এলাকা ছিল অন্যতম।[৩] আনোয়ার হোসেন এসমস্ত কৃষক আন্দোলনে শরিক হয়েছিলেন বলে জানা যায়। কিন্তু বিস্তারিত তথ্য এই গ্রন্থে নাই।

মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিক ও সংগঠক নির্মল সেনের আত্মজীবনী *আমার জবানবন্দী* আনোয়ার হোসেনকে জানার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। *আমার জবানবন্দী* ২০০০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। আত্মজীবনীতে নির্মল সেন তার জেল জীবনের নানা ঘটনা সবিস্তারে

---

[১]সত্যেন সেন, *গ্রাম বাংলার পথে পথে*, কলকাতা: বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ১৯৬০, পৃ. ৬৯,৭০।

[২]বদরুদ্দিন উমর, *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি* (১ম খণ্ড), ঢাকা: সুবর্ণ প্রকাশনী, ১৯৭০, পৃ. ৩১১।

[৩]বদরুদ্দিন উমর, *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি* (২য় খণ্ড), ঢাকা: সুবর্ণ প্রকাশনী, ১৯৭০, পৃ. ২৫১।

CamScanner

আলোচনা করেছেন। তিনি যখন ঢাকা জেলে ছিলেন তখন আনোয়ার হোসেনও ঢাকা জেলে বন্দী ছিলেন। বাগেরহাট থেকে গ্রেফতার হয়ে ঢাকা কারাগার হয়ে আনোয়ার হোসেনকে রাজশাহী কারাগারে পাঠানো হয়। আত্মজীবনীর ৪৪ পৃষ্ঠায় তিনি আনোয়ার হোসেন সম্পর্কে লিখেছেন: মনে আছে খুলনার আনোয়ারের কথা। খুলনার আনোয়ার। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা জেলে এসেছিল। মাত্র কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। ছোটখাটো ছেলেটি। কম বয়সের দিক থেকে আমরা তখন ঢাকা জেলে তিনজন বন্দী ছিলাম। তিনজন হচ্ছি- আমি, একসময়ের মফস্বল সাংবাদিকদের নেতা শফিউদ্দিন আহমেদ ও খুলনার আনোয়ার। বয়স কম বলে জেলখানায় খাওয়ার দিক থেকে সুবিধা পেতাম। পাশাপাশি জেলে থেকে অনশন ধর্মঘট করেছি দিনের পর দিন। তার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল এলাকায়।[৪]

মার্ক্সবাদী সংগঠক ও লেখক রনেশ দাশ গুপ্ত রচিত *আলো দিয়ে আলো জ্বালা* গ্রন্থটি ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের উৎসর্গপত্রে লেখক লিখেছেন: খুলনার সেই সবেমাত্র কৈশোর পার হয়ে যৌবনে পা দেওয়া সাহসী তীক্ষ্মধী তেজি ছেলেটি। রাজশাহী জেলে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৪ এপ্রিলের গুলি চালনায় নিহত সাতজন রাজনৈতিক বন্দির মধ্যে সে ছিল সর্বকনিষ্ঠ। ওই বয়সেই বিতর্ক কুশলী হিসেবে সে নাম করেছিল। সাহিত্য-শিল্পকলায় তার দখল দেখে চমক লাগত। একা একা বই পড়ে মজা পেতনা বলে বই নিয়ে সে বের হত শ্রোতা পাকড়াও করার জন্য। কারাগারে সে অনেক প্রশ্নই তুলেছিল ভাল-মন্দ, সুন্দর-কুৎসিত সম্পর্কে এবং জবাব চেয়েছিল তার স্বভাবসুলভ ঝাঝালো ভঙ্গিতে। কিন্তু জবাব দেওয়ার মত ফুরসত সে পায়নি সেসময়ে।[৫]

মতিউর রহমান কর্তৃক রচিত *খাপড়াওয়ার্ড হত্যাকান্ড ১৯৫০* গ্রন্থটি আনোয়ার হোসেনকে জানার জন্য অন্যতম একটি উৎস। ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত এই বইটিতে ৬টি অধ্যায় ও ৫টি পরিশিষ্ট রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে খাপড়াওয়ার্ডের সাত শহীদ শিরোনামে খাপড়াওয়ার্ডের স্মৃতিচারণমূলক বিভিন্ন বক্তব্য ও বইয়ের পর্যালোচনা করেছেন লেখক। ৫ম অধ্যায়ে খাপড়াওয়ার্ড হত্যাকান্ড শিরোনামে ২৪ এপ্রিলের বিস্তারিত ও বিশ্লেষণধর্মী বর্ণনা এসেছে। আনোয়ার হোসেনের মৃত্যু প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- গুলিতে তার মুখের বাদিকটা উড়ে যায়।[৬]

২০২২ খ্রিস্টাব্দে আগামী প্রকাশনী থেকে এম আবদুল আলীমের *রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন: জেলাভিত্তিক ইতিহাস* বইটি প্রকাশিত হয়। বইটিতে ভূমিকা ও উপসংহারসহ মোট ৯ টি অধ্যায় রয়েছে। বইটির ৫ম অধ্যায়ে খুলনা বিভাগে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রসঙ্গ এসেছে। তবে ভাষা আন্দোলনের পূর্বে ব্রিটিশ শাসনের একেবারে শেষ প্রান্তে বামপন্থী সংগঠকদের

[৪]নির্মল সেন, *আমার জবানবন্দী*, ঢাকা: ইত্যাদি, ২০০০, পৃ. ৪৪।
[৫]রনেশ দাশ গুপ্ত, *আলো দিয়ে আলো জ্বালা*, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৭০ দ্র. উৎসর্গপত্র।
[৬]মতিউর রহমান, *খাপড়াওয়ার্ড হত্যাকান্ড ১৯৫০*, ঢাকা: প্রথমা, ২০১৫, পৃ. ৬২।

CamScanner

নেতৃত্বে যেসব কৃষক আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল লেখক তা তুলে ধরেছেন। ভাষা আন্দোলনের আলোচনায় লেখক ছাত্র ফেডারেশনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে আনোয়ার হোসেনের প্রসঙ্গ এনেছেন।[৭]

আনোয়ার হোসেন ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি উপজেলার বুধহাটা ইউনিয়নের হাবাশপুর গ্রামে মাতুলালয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। তার নানা মাছের সর্দার বিত্তবান ছিল। তার পৈত্রিক ভিটা আশাশুনি উপজেলার শোভনালী। মা পরিজান বিবি আর বাবা কনুই গাজীর তিন সন্তানের মধ্যে আনোয়ার হোসেনই বড়। মেঝ ছেলে আজিবার হোসেন ও ছোট ছেলে আবুল হোসেন। মেঝ ছেলে আজিবার নাকে ফোড়া হয়ে মারা যায়। ছোট ছেলে আবুল হোসেন বুধহাটার হাবাশপুরে থাকত। তবে একটু বয়স্ক হলে যশোরের শার্শা থানার বাগআঁচড়ার শিবনাথপুরের বারপোতায় চলে যায়। এখানেই ছোট ছেলের সাথে তার মা পরিজান বিবি থাকত। এই শার্শাতেই আনোয়ার হোসেনের মা পরিজান বিবি মারা যান। [৮]

হাবাশপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আনোয়ারের প্রাথমিক শিক্ষার হাতে খড়ি। এটি সাতক্ষীরার আশাশুনির উপজেলার একটি গ্রাম। এই গ্রামেই তাঁর জন্ম। আনোয়ারের মাধ্যমিক পড়াশোনা শুরু বুধহাটা বি. বি. এম হাইস্কুলে। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে খুলনা জিলা স্কুলে ভর্তি হন আনোয়ার। কুমিল্লার অধিবাসী এক দারোগার খুলনা শহরে নদীর ধারে একটি বাসা ছিল। এই বাসায় দারোগার ছেলেকে পড়ানোর জন্য লজিং থাকত আনোয়ার। আনোয়ার আর তার ছাত্র একই শ্রেণির ছাত্র ছিল আর তাদের নামও একই ছিল। পড়ানোর কারণেই থাকা-খাওয়া সুবিধা পায় সে। খুলনা জেলা স্কুলে আনোয়ার নিজের প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও পান্ডিত্যের পরিচয় দেয়। ক্লাসের অন্যতম সেরা ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও রাজনীতি করার কারণে নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থাকতে পারতোনা আনোয়ার। ক্লাসের শিক্ষকরা প্রধান শিক্ষকের কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ করলে আনোয়ারকে তলব করে প্রধান শিক্ষক কে.বি সেনগুপ্ত তিরস্কার করেন। আনোয়ারের সহপাঠী এম এ হালিম এসময়কার আনোয়ারের স্মৃতিচারণ করে বলেন, পরদিন দেখি আনোয়ার বাংলা থেকে দশ-দশটি ইংরেজি ট্রান্সলেশন প্রতিটি দু-তিন রকম করে ভিন্ন ভিন্ন ইংরেজি শব্দ দিয়ে কারেক্ট করার জন্য জমা দেয়। আমরা তো থ! ভূপেনবাবুও।[৯] মাধ্যমিকে বিজ্ঞান বা টেকনিক্যাল থেকে পরীক্ষা দিতে চেয়েছিল আনোয়ার। কিন্তু বার্ষিক পরীক্ষার আগে সাধারণ বিভাগ থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার কারণে ফল খুব বেশি ভাল হয়নি।[১০]

---

[৭]এম আবদুল আলীম, *রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন: জেলাভিত্তিক*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০২২, পৃ. ৭৫৬।

[৮]সাক্ষাৎকার: আশার আলী (৭৮), (আনোয়ারের মামা), হাবাশপুর, বুধহাটা, সাতক্ষীরা। তারিখ: ৩১/০৩/২০২৩।

[৯]মতিউর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪।

[১০]মতিউর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৫।

বাংলা ও ইংরেজিতে বিরামহীন বক্তব্য করতে পারতেন আনোয়ার হোসেন। স্কুলের ছাত্রসংসদে আনোয়ার হোসেন একচেটিয়া ভোট পেত। স্কুলের পিটি শিক্ষক প্রার্থনা সঙ্গীত গাওয়া শুরু করলে আনোয়ার শুধু গলা মেলাত বা মুখ নাড়িয়ে দাড়িয়ে থাকত বা মাথা চুলকাত। কারণ, গ্রেট ব্রিটেনের জাতীয় সঙ্গীত (গড সেইভ আওয়ার গ্রেসিয়াস কিং, লং লিভ আওয়ার নোবল কিং, গড সেইভ দ্যা কিং) গাইতে আনোয়ারের মন সায় দেওয়ার কথা না।[১১]

পড়াশোনায় অত্যন্ত ভাল হলেও রাজনীতি তার পিছু ছাড়েনি। মানুষের প্রতি মমত্ববোধের কারণে মন ছুটে যেত বার বার ক্লাস রুমের বাইরে। কৃষকদের স্বার্থ সুরক্ষা আন্দোলনেও আনোয়ার ছিল নিবেদিতপ্রাণ এক কর্মী। চল্লিশের দশকের শেষের দিকে বৃহত্তর যশোর অঞ্চলে সংঘটিত বিভিন্ন আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন আনোয়ার। পাটচাষ আইন অমান্যকরণ আন্দোলন, হাটতোলা বন্ধ, মৌভাগ কৃষক আন্দোলন ও তেভাগা আন্দোলন ছিল অন্যতম। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করো, সামন্ততন্ত্রের অবসান করো, পুলিশের দালালকে হালাল করো- শ্লোগানে খুলনার ডুমুরিয়ার কৃষক বিদ্রোহ মুখরিত ছিল। এসব বিদ্রোহ জমিদারদের মসনদ নাড়া দেয়। এই আন্দোলনে যারা নেতৃত্বে ছিলেন তারা হলঃ বিষ্ণু চ্যাটার্জি, কুমার মিত্র, সতীশ হালদার, মহেন্দ্রনাথ কুন্ডু, হাজারীনাথ হাজরা, আদিলদ্দিন মোল্লা, আফসার মোড়ল, নকুল মল্লিক, সোনাই শেখ প্রমুখ।[১২] কমরেড বিষ্ণু চ্যাটার্জি, কমরেড শচীন ওরফে খোকা বোসের নেতৃত্বে ১৯৪০-১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে খুলনা জেলার ডুমুরিয়ার ঘাটভোগ ও ডোবা অঞ্চলে বাধবন্দী ও খাসজমি দখলের আন্দোলনে অংশ নেন আনোয়ার। ডোবায় বড় খাল খননের কাজ চলছে। সবার আগে হাজির হবার চেষ্টা করত আনোয়ার। ঘুম থেকে দেরিতে ওঠায় খাল খননকারী অন্যদের সাথে যোগ দিতে দীর্ঘ ৫ মাইল দৌড়ে ঘাটভোগ নামক স্থানে গিয়ে সহকর্মী খননকারীদের সাথে মিলিত হন।[১৩] কোনো কোনো রাত এমনও গেছে যে, এক গাল মুড়ি আর এক গ্লাস পানিতে রাত পার করেছে আনোয়ার। টাকার অভাব ছিল প্রচন্ড। পার্টির ফান্ডের জন্য নিজের হাতে চানাচুর তৈরি করে ফেডারেশনের কর্মীদের নিয়ে পথে পথে তা বিক্রি করতে হয়েছে তাকে। হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, অমানষিক পরিশ্রম ও প্রতিনিয়ত অনাহারে থাকার কারণে একসময় ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হন। ম্যালেরিয়া থেকে সেরে উঠতে ম্যাপাক্রিন সেবন করতে হত আনোয়ারকে। অসুস্থ শরীর, অক্লান্ত পরিশ্রম আর খাটুনির প্রভাবে মানসিক রোগ দেখা দেয়। স্বাস্থ্যকর খাবারের অভাবে ও সেবনরত ঔষধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় আনোয়ারের মস্তিষ্ক স্বাভাবিক কাজ করা বন্ধ করে দেয়। দলের অনুগামী সদস্যরা তাকে কলকাতায় কমরেড মোজাফ্ফর আহমদ প্রতিষ্ঠিত হাসপাতাল রেড কিউর হোমে (Red Cure Home) পাঠায়। অসুস্থ দলীয় কর্মীদের চিকিৎসার জন্য ভারতের

---

[১১]ঐ, পৃ. ১৩৫।

[১২]এ. এফ. এম আব্দুল জলীল, *পূর্ব বাংলার কৃষক বিদ্রোহ*, পৃ. ১১০।

[১৩]এস এম চন্দন, খাপড়া ওয়ার্ডের শহীদ আনোয়ার, *সাপ্তাহিক একতা*, ২২ অক্টোবর, ২০২৩।

CamScanner

কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম উদ্যোক্তা কমরেড মোজাফ্‌ফার আহমদ এই হোম প্রতিষ্ঠা করেন। চিকিৎসা শেষে দৌলতপুর কলেজে আই.এ প্রথম বর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশ নিয়ে প্রথম স্থান অর্জন করে।[১৪]

মাধ্যমিক থেকে শুরু করে উচ্চ মাধ্যমিক-এই কালপর্বে আনোয়ার নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিল মেহনতি মানুষের মুক্তি আন্দোলনে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের আগষ্টে নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান গঠিত হওয়ার পরে আনোয়ারের সংগ্রাম ভিন্নরূপ পায়। গণপরিষদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের বাংলা ভাষার প্রস্তাব নাকচ হলে দেশের অনেক জেলার মত খুলনাতে এর প্রভাব পড়ে। খুলনা দৌলতপুর কলেজ (বি. এল কলেজ) মুসলিম ছাত্রলীগ, ছাত্র ফেডারেশন ও ছাত্র কংগ্রেসের আধিপত্য ছিল। ২৭ ফেব্রুয়ারি দৌলতপুর কলেজে প্রতিবাদ সভা হয়। এই সভায় বক্তব্য দেন আমজাদ হসেন, ধনঞ্জয় দাস, মনসুর আলী ও জগদীশ বসুর মত ছাত্রনেতৃবৃন্দ।[১৫] ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১১ মার্চ ভাষা আন্দোলনের পক্ষে যে হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত হয় খুলনার দৌলতপুর কলেজসহ অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা সেটা পালন করে। আহমদ রফিকের বিবরণীতে-

> "১১ মার্চের আন্দোলন খুলনায় খুব ভালোভাবেই চলেছে। ছাত্র ধর্মঘট, মিছিল, স্লোগান এবং সবশেষে মিউনিসিপাল পার্কে প্রতিবাদ সভার অনুষ্ঠান। কিন্তু, সরকারি প্রশাসন, মুসলিম লীগের অপপ্রচার ও হুমকি ইত্যাদির কারণে সভায় লোকসমাগম ছিল অল্প। অবশ্য খুলনা শহরের স্কুল ছাত্ররা সেদিন দৌলতপুর থেকে আসা মিছিলে যোগ দিতে দ্বিধা করেনি।"[১৬]

১৯৪৮ কালপর্বের ভাষা আন্দোলনকে সফল করতে যারা এগিয়ে এসেছিলেন আনোয়ার হোসেন তার মধ্যে অন্যতম। আনোয়ার হোসেন মূলত ছাত্র ফেডারেশনের কর্মী ছিলেন। ছাত্র ফেডারেশনের নেতা ছিল স্বদেশ রায়, সন্তোষ দাস, ধনঞ্জয় দাস ও মুসলিম লীগের প্রগতিশীল অংশের নেতা তাহমিদ উদ্দীন আহমেদ, জিল্লুর রহমান এবং মতিয়ার রহমান। ১১ মার্চ বিকালে গান্ধী পার্কে (বর্তমান হাদিস পার্কে) ছাত্রদের প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পুলিশ সভাস্থলের চারপাশে বেষ্টনী দিয়ে রাখে। সভাপতির বক্তব্য শেষে একটি রেজুলেশন পাঠ করে তড়িঘড়ি সভা শেষ হয়।[১৭] রেজুলেশন পাঠ করে ছাত্রনেতা আনোয়ার হোসেন। ১১ মার্চ বিকাল থেকে আন্দোলনকারীদের গ্রেফতার ও নির্যাতন চলতে থাকে। আনোয়ার হোসেনসহ তাহমিদ উদ্দীন, শৈলেন ঘোষ, সন্তোষ দাস গুপ্ত, ধনঞ্জয় দাস, স্বদেশ বসু ও মতিউর রহমানকে এদিন গ্রেফতার করা হয়। ১০ ও ১১ মার্চ যাদের গ্রেফতার করা হয় তাদের অধিকাংশকেই পরবর্তীতে মুক্তি দেওয়া হলেও আনোয়ার হোসেন ও স্বদেশ বসুকে আটক রেখে নির্যাতন করা হয়। খুলনার পুলিশ সুপার মহিউদ্দিন আহমদ তাদের ডেকে এই বলে পাকিস্তান বিরোধী কাজ থেকে তাদেরকে দূরে

---

[১৪]এস এম চন্দন, খাপড়া ওয়ার্ডের শহীদ আনোয়ার, *সাপ্তাহিক একতা*, ২২ অক্টোবর, ২০২৩, পৃ. ১৩৬।
[১৫]আব্দুল আলিম, *ভাষা আন্দোলনের জেলা ভিত্তিক ইতিহাস*, ঢাকা: আগামী, পৃ. ৭৫৫।
[১৬]আহমদ রফিক, *ভাষা আন্দোলন: টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া*, ঢাকা: প্রথমা, ২০১৯, পৃ. ১২৭।
[১৭]রতনলাল চক্রবর্তী, *ভাষা আন্দোলন:* আঞ্চলিক ইতিহাস, পৃ. ৬৩।

CamScanner

থাকতে বলেন যে, হিন্দু ও কমিউনিস্ট শিশুরাষ্ট্র পাকিস্তানকে দূর্বল/ভঙ্গুর করার জন্য ষড়যন্ত্রে নেমেছে।[১৮] গ্রেফতারের পরে পুলিশ সুপার মহিউদ্দীন জিজ্ঞাসাবাদকালে আনোয়ার হোসেনকে বলেন,"তুমি কি জিন্নাহ সাহেবের চেয়ে বেশি বোঝ নাকি?" জবাবে আনোয়ার হোসেন বলেন, "জিন্নাহ সাহেব জিন্নাহ সাহেবের মত বোঝেন, আর আমি বুঝি আমার মত।" এ ধরনের উত্তরের জন্য এসপি মহোদয় অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। অগ্নিশর্মা হয়ে আনোয়ারের মুখে ঘুষি মারেন।[১৯]

এসময় ছয় মাস আটক থাকার পর মুক্তি পেলেও আনোয়ারের বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি হয়। আনোয়ারের মামা বাবর আলী তাকে তৎকালীন সরকারের নিকট আত্মসমর্পন করতে বললেও আনোয়ার তাতে কর্ণপাত করেনা।[২০] খুলনা শহরের কাজী আফতাব উদ্দীনের বাড়িতে সেসময় আনোয়ার হোসেন কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকে। এখান থেকে পরবর্তীতে বাগেরহাটের বাহিরদিয়া এলাকায় স্থানান্তরিত হয়। সেখানে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত থাকাবস্থায় সরকারের গোয়েন্দা বাহিনী গ্রেফতার করে আনোয়ারকে।[২১] গ্রেফতার করে আনোয়ারকে ঢাকা জেলে স্থানান্তর করা হয়। তৎকালীন ঢাকা জেলে বন্দী বামপন্থী লেখক ও সংগঠক নির্মল সেন তার আত্মজীবনী *আমার জবানবন্দীতে* লিখেছেন, ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি যখন ঢাকা জেলে ছিলেন তখন আনোয়ার হোসেনের সাথে তাঁর দেখা হয়। আনোয়ার কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিল।[২২]

সেই সময়ের উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বামপন্থী নেতা অনিল মুখার্জী মন্তব্য করেছেন, 'মুসলিম লীগের নেতা সবুর খাঁ থেকে গ্রামের গুন্ডা মুসলিম লীগ কমিটি পর্যন্ত আনোয়ারকে ঘিরে ধরল, তুমি মুসলমানের ছেলে, হিন্দু কমিউনিস্টদের সঙ্গে মিলে ছাত্র ফেডারেশন করবে কেন, মুসলিম ছাত্রলীগে যোগ দাও। তারা আনোয়ারকে নানা প্রলোভন দেখাল। তার মাকেও প্রলোভন দেখাল। আনোয়ার এমন কীর্তিমান ছেলে, মুসলিম লীগে যোগ দিলে তার কত উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, শুধু যে পড়াশোনা আর টাকার চিন্তা করতে হবে না তা-ই নয়, ভবিষ্যতে যা চায়, তা-ই পাবে। আনোয়ারকে তারা জেল ও ফাঁসির ভয়ও দেখাল। যেমন কথা তেমন কাজ। আনোয়ারও এ কথা মেনে নিল না যে, বাঙালি হিন্দু-মুসলমান দুটি স্বতন্ত্র জাতি। মুসলিম লীগের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থ ছিল, তাই আনোয়ারকে বিনা বিচারে জেলে আটক হতে হলো। শেষ পর্যন্ত মুসলিম লীগের ঘাতকদের হাতেই তাকে জীবন দিতে হলো।'[২৩]

---

[১৮]আহমদ রফিক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৭। ।

[১৯]এম এ হালিম, খুলনায় ভাষা আন্দোলন (আটচল্লিশ ও বায়ান্নো), খুলনা: ১৯৮৫, পৃ. ৬।

[২০]সাক্ষাৎকার: আছির উদ্দিন (৮৫), (আনোয়ারের খালাতো ভাই), পেশা: কৃষক, হাবাশপুর, বুধহাটা, সাতক্ষীরা। তারিখ: ১৯/০২/২০২৩।

[২১]এম, এ হালিম, যে ফুল ফুটিতে, *সাপ্তাহিক একতা*, ২৩ এপ্রিল, ১৯৮২।

[২২]নির্মল সেন, *আমার জবানবন্দী*, ঢাকা: ইত্যাদি প্রকাশনী, পৃ. ৪৪।

[২৩]মতিউর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯

ব্রিটিশ আমলে দেশের বিভিন্ন কারাগারে কারাবন্দীরে যে অধিকার ছিল পাকিস্তান সরকার তাতে কয়েদীদের বঞ্চিত করতে শুরু করে। এসবের প্রতিবাদে কারাগারগুলোতে বন্দীদের নায্য অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন আন্দোলন হয়। যে আন্দোলনগুলো পাকিস্তান সরকার দমন-পীড়ন-নির্যাতন এমনকি হত্যাকান্ডের মাধ্যমে বন্ধ করতে তৎপর হয়। খুলনা জেলার ধানিবুনিয়া-কালশিরা এলাকায় তেভাগা আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী ও সংগঠক ছিলেন হরসিত মন্ডল। বার্ধক্যজনিত জটিলতার পাশাপাশি জেলে অমানষিক নির্যাতনের কারণে তিনি জেলেই মৃত্যুবরণ করেন।[২৪]

রাজশাহী জেলের একটি বিখ্যাত ওয়ার্ডের নাম খাপড়াওয়ার্ড। এটি টালির ছাদ বিশিষ্ট আট চালা একটি ঘর; যেটি জেলের রাজবন্দীদের জন্য নির্দিষ্ট ও সুরক্ষিত ছিল। ওয়ার্ডের চারপাশে আলাদা দেয়াল দিয়ে ঘেরা। এক কক্ষের এই ওয়ার্ডের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে ৬০ ফুট ও ৫৪ ফুট। মেঝ ছিল মাটি থেকে তিন ফুট উচু। ফ্রেম ছিল লোহা ও কাঠের ছাউনি ছিল মাটির খাপড়া বা টালির। চাল ছিল দো-চালা।[২৫] খাপড়াওয়ার্ডে উঠতে গেলে সিড়ি ব্যবহার করতে হত। খাপড়াওয়ার্ডের জানালাগুলো মেঝে থেকে ছাদের কাছাকাছি পর্যন্ত গরাদ বসানো। জানালাগুলো মূলত দরজার মত একই মাপের। ওয়ার্ডের চারপাশে মোট ২৪ টা জানালা ছিল।[২৬]

খাপড়াওয়ার্ডের খাবার ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের। শুধুমাত্র জীবন বাঁচাতেই রাজবন্দীরা এই খাবার গলধঃকরণ করত। জামা-কাপড়ের কোনো ব্যবস্থা ছিলনা। বিছানা চাদর, বালিশ, মাথার তেল এসব নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মারাত্মক সংকট ছিল। অনেক বন্দী কোম্বলকে বিছানা করে খাবার প্লেটকে বালিশ হিসাবে ব্যবহার করত। ওয়ার্ডে আগুন ধরিয়ে দেবার অজুহাতে বন্দীদের আলোর ব্যবস্থা করা হতনা।[২৭] নিষ্ঠুর কারাজীবন, নিম্নমানের খাবার ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে অনেক বন্দী মানসিক বিকারগ্রস্থ হয়ে পড়ে। ১৯৪৮-১৯৫০ কালপর্বে বামপন্থী রাজনীতিবিদদের উপর নির্যাতন, অপচিকিৎসা ও বিনা চিকিৎসায় অনেক রাজবন্দী কারাগারেই মারা যায়।[২৮] কারাবন্দীরা কেউ অসুস্থ হলে ডাক্তাররা একই ঔষধ ও প্রেসক্রিপশন ব্যবহার করত। যার মধ্যে ছিল-এলকেলি, কুইনাইন, বিসমাত অথবা কারমিনেটিভ মিকচার। জেলখানায় আনোয়ার হোসেন কথায় কথায় সুর মিলিয়ে গান করত।[২৯] আনোয়ার হোসেন এই বিষয়টির উপর ব্যাঙ্গাত্মক গান রচনা করে তাতে সুর দিয়েছিল। ডাক্তার যখন ওয়ার্ডে আসত আনোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে অন্য রাজবন্দীরা সুর করে এই গান গাওয়া শুরু করতেন।

---

[২৪]পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপাত্র *শিখা* পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা, ১৮ এপ্রিল, ১৯৬১, পৃষ্ঠা-৩০।
[২৫]মতিউর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ .২৬।
[২৬]মতিউর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১।
[২৭]পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র *শিখা* পত্রিকার বিশেষ সংখা, পৃ. ২৬-২৭।
[২৮]পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র *শিখা* পত্রিকার বিশেষ সংখা, পৃ. ২৬-২৭।
[২৯]মতিউর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০০।

CamScanner

হায়রে কারমিনেটিভ
তোরে আমি রাখিব কোথায়
দাঁতের ব্যাথায় কারমিনেটিভ,
বাতের ব্যাথায় কারমিনেটিভ
কারমিনেটিভ খাবে তুমি
কারমিনেটিভ ধন্বন্তরি
লাল গোলাপ ঊর্ণা পরি,
ডাক্তার রোগীর মন ভুলাইছে
রঙিনও নেশায়।
কারমিনেটিভ তুমি দেবী
সর্ব রোগে তোমায় সেবি
তোমা বিনা জেলখানাতে
টিকা বড় দায়।[৩০]

১৯৪৯-১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন কারাগারে কারাবন্দীরা অনশন ধর্মঘট পালন করতে থাকে। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের মে-জুন মাসের দিকে বন্দীদের দ্বিতীয় অনশন ধর্মঘট শেষ হয়। এসময় আত্মহত্যার অভিযোগে অনশনকারীদের এক বছর সশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হয়। রাজবন্দীরা সশ্রম কারাদণ্ডের সুবাদে বিভিন্ন চাকরীতে সাধারণ বন্দীদের সাথে মেশার সুযোগ পায়।[৩১] জেল কর্তৃপক্ষের অমানবিক আচরণের প্রতিবাদ করার তীব্র ইচ্ছা সাধারণ কয়েদীদের থাকলেও পর্যাপ্ত সাহস ও উপযুক্ত সহায়তার অভাবে তাদের সে ইচ্ছা এতদিন সুপ্ত ছিল। রাজবন্দীদের সাহচর্যে এসে তাদের সেই সুপ্ত ইচ্ছা জাগ্রত হয়। রাজবন্দীদের আশ্বাস পেয়ে প্রতিবাদ করার মানসিকতা দৃঢ় হয়। রাজবন্দী মনসুর হাবিব ও আরও দু'একজনের সহায়তায় কারাবন্দীরা তাদের দীর্ঘদিনের দাবি দাওয়া সম্বলিত মেমোরেন্ডামের খসড়া তৈরি করে সেটা জেল কতৃপক্ষের নিকট পেশ করা হলে কর্তৃপক্ষ সেটা কর্ণপাত করেনা। এর ফলশ্রুতিতে সাধারণ কয়েদিরা ৫ এপ্রিল, ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করে। রাজবন্দীরাও সাধারণ কয়েদীদের অনশনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে ৭ এপ্রিল থেকে অনশন ধর্মঘট শুরু করে।[৩২] ৯ এপ্রিল, ১৯৫০ ইন্সপেক্টর জেনারেল অব প্রিজন আমির হোসেন রাজশাহী জেল পরিদর্শনে আসেন। এসময় অনশনকারী বন্দীদের অনশন ধর্মঘট প্রত্যাহারের আহবান জানালেও তারা সেটা মানতে অস্বীকৃতি জানায়। আমির হোসেন এসময় রাজবন্দীদের নিকট গিয়ে তাদের অনশন ধর্মঘট ভঙ্গের আবেদন জানিয়ে ব্যর্থ হন। আমির হসেন জেলসুপারকে রাজবন্দীদের ১৫-১৬ জনকে কনডেমড সেলে সরিয়ে নেওয়ার আদেশ দেন। রাজবন্দীরা

---

[৩০]মতিউর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ-১২৯।
[৩১]উমর, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৩০৭।
[৩২]উমর, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৩০৮।

CamScanner

নির্দেশ মানতে অস্বীকৃতি জানায়। যদিও তাদের মধ্যে দু'একজন আদেশ অমান্যের বিরোধিতা করেছিল।[৩৩]

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৪ এপ্রিল দিনটা ছিল সোমবার। খাপড়াওয়ার্ডে তখন ৪১ জন বন্দী ছিল। সকালের নাস্তার জন্য বন্দীরা ব্যস্ত সময় পার করেছিল। ঘড়িতে তখন সকাল প্রায় ন'টা। জেল সুপারিনটেনডেন্ট ডব্লিউ. এফ. বিলের সাথে জেলার মান্নান, জেলের ডাক্তার, দুজন ডেপুটি জেলার, হেড ওয়ার্ডারসহ আরও কয়েকজন খাপড়াওয়ার্ডে আসে। জেল সুপার বিল যশোরের আব্দুল হকের কাছে গিয়ে বলেন, Be ready Haque, some of you are segregated now. আব্দুল হক প্রত্যুত্তরে বলেন, Just sit down please, we have talks with you about this matter.[৩৪]

তুখোড় বক্তা ও মেধাবী ছাত্রনেতা আব্দুল হক বিলকে বলেন, জেল কর্তৃপক্ষকে তাদের খাবার মেন্যু পাল্টাতে হবে। কারণ, প্রতিদিন দু'বেলা তারা কুমড়ার ঘ্যাঁট আর খেতে পারছেনা। উত্তরে বিল বলেন, ক্রিমিনালদের যেটা দেওয়া হচ্ছে সেটাই তাদের জন্য অতিরিক্ত। এর বেশি দেওয়া অসম্ভব। এবার কনডেমড সেলে যাবার ব্যাপারে আব্দুল হক তাদের আপত্তির কথা বিলকে অবহিত করেন। কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে বিল তার হাতের ছড়ি দিয়ে একজন বন্দীকে মারতে উদ্যত হলে রাজবন্দীদের মধ্যে একজন ছড়িসহ বিলকে বারান্দা থেকে খাপড়াওয়ার্ডের মধ্যে ঢোকান। রাজবন্দীদের সাথে আলাপরত অবস্থায় এসময় দুজন ডেপুটি জেলার ওয়ার্ডের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। বিলকে ঘরের মধ্যে ঢোকানোর সাথে সাথে জেলার মান্নান হুইসেল বাজানো শুরু করেন। দু'জন ডেপুটি জেলার বাদে বিল ও অন্যরা বন্দীদের নিকট থেকে দ্রুত ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে ওয়ার্ডের বাইরে এসে হুইসেল ও পাগলা ঘন্টা বাজায়। সেপাইরা এসময় জানালা ও ভেন্টিলেটরের ফাঁকা অংশ দিয়ে বন্দুক ঢুকিয়ে রাজবন্দীদের উপর ৬০ রাউন্ড গুলি ছড়েন।[৩৫]গুলিতে প্রথমেই মারা যান হানিফ শেখ।[৩৬] কোনও বর্ণনায় এসেছে প্রথমে দেলোয়ার হোসেন মারা যান।[৩৭]এরপর মারা যায় আনোয়ার হোসেন। আনোয়ার হোসেনের মুখের বা'দিকটা উড়ে যায়।[৩৮] কুষ্টিয়ার হানিফ শেখের বাম হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে চামড়ার সাথে অল্প একটু ঝুলে ছিল। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে কিছুক্ষণেই মধ্যেই তার মৃত্যু হয়। রংপুরের সুধীন ধরের পেটে গুলি লেগে মারা যায়। ময়মনসিংহের সুখেন ভট্টাচার্য্যের বুকের এক পাশে গুলি লাগে। দিনাজপুরের কম্পরাম সিংহ ঘটনার পরের দিন মারা যায়।

---

[৩৩]উমর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৯।

[৩৪]আব্দুস শহীদ, *কারাস্মৃতি*, ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৭৭, পৃ.১০১।

[৩৫]উমর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১০।

[৩৬]উমর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১০।

[৩৭]মতিউর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১।

[৩৮]মতিউর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৫।

গুরুতর আহত হয় বর্ধমানের নুরুন্নবী চৌধুরী, বগুড়ার শ্যামাপদ সেন, বর্ধমানের সৈয়দ মনসুর হাবিবুল্লাহ, দিনাজপুরের ভুজেন পালিত।[৩৯]

আনোয়ার হোসেনের মৃত্যুর পরে তার বাকপ্রতিবন্ধী মা পাগল হয়ে যায়। কেউ আনোয়ারকে দেখেছে কি-না ইশারা করে এমন বোঝাত আর বিলাপ করত।[৪০] ছেলের মৃত্যুর পরে সরকার তার পরিবারের নির্যাতন করতে পারে এই আশঙ্কায় আনোয়ারের পরিবার সাতক্ষীরার বুধহাটা থেকে যশোর চলে যায়।[৪১]

সাত বীর শহিদের মরদেহ শেষ পর্যন্ত কি পরিণতি হয়েছিল তা আজও প্রকাশ করা হয়নি। তদন্ত কমিটি গঠিত হলেও পরে এ ব্যাপারে কিছুই জানা যায়না। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসের শেষের দিকে সরকারি প্রেসনোটে বিবৃতি প্রকাশ হয় এমন- 'রাজশাহী জেলের মধ্যে কিছু বন্দী জেল পুলিশের রাইফেল ছিনতাই করতে উদ্যত হলে পুলিশ বাধ্য হয়ে গুলি নিক্ষেপ করলে তাতে কয়েকজন কয়েদী নিহত ও কিছু কয়েদী আহত হয়।' ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে কমিউনিস্ট পার্টির গোপন সভায় ২৪ এপ্রিল খাপড়াওয়ার্ড দিবস হিসেবে পালন হত। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে দিনটি সম্পর্কে সাধারন মানুষ জানার সুযোগ পায়। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি ও পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের বিরোধী দলের নেতা আতাউর রহমান খান ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে খাপড়াওয়ার্ড হত্যাকান্ড নিয়ে যে তদন্ত কমিটি গঠিত হয়, তার প্রতিবেদন প্রকাশের দাবী জানিয়ে বিবৃতি দিলে তখন এ বিষয়টি সচেতন মহলের জানার সুযোগ তৈরি হয়।

সদ্য কৈশোর-উত্তীর্ণ মেধাবী কিশোর আনোয়ার হোসেন ছিল একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ। মাত্র ২০ বছর বয়সেই তৎকালীন সরকারের কারাগারে দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের হাতেই তাঁর জীবন প্রদীপ নিভে যায়। এত অল্প সময়ে দেশ, জাতি, মানুষ, মানবতার জন্য সে যেভাবে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিল তা ছিল বিরল। নিম্ন মধ্যবর্তী পরিবারে পড়ালেখা শিখে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চিন্তা, সরকারি তরফ থেকে আকর্ষনীয় প্রলোভন ও সচ্ছল জীবনের হাতছানিও বঞ্চিত-নির্যাতিত ও অবহেলিত মানুষের মুক্তির আন্দোলন থেকে তাকে টলাতে পারেনি। তাঁর আত্মপ্রত্যয় দেখে শাসকগোষ্ঠী তাকে বাইরে রাখতে নিরাপদ বোধ করেনি। কারাগারে ভরেও তারা নিশ্চয়তা না পেয়ে নির্মমভাবে বদ্ধ কক্ষে গুলি করে হত্যা করে। ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধে ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলনের যেমন সুদূরপ্রসারী ভূমিকা ছিল; তেমনি ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্বের আন্দোলনকারীদের অনুপ্রেরণা ও সাহস জুগিয়েছিল ১৯৫০ এর ২৪ এপ্রিল খাপড়াওয়ার্ডে হত্যাকান্ডের ঘটনা।

---

[৩৯]মতিউর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৫।

[৪০]মতিউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০।

[৪১]সাক্ষাৎকার: মরিয়ম বিবি (৮০), (আনোয়ারের মায়ের খাল তো বোন), হাবাশপুর, বুধহাটা, সাতক্ষীরা। তারিখ: ১৯/০২/২০২৩

ইতিহাস প্রবন্ধমালা

ISSN- 2074-8663

Itihas Prabandhamala

Peer-Reviewed Journal

বর্ষ ২১, সংখ্যা ১৯, ফাল্গুন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
Voll. 21, No. 19, Falgun 1430 Bangabda/ February 2024 AD

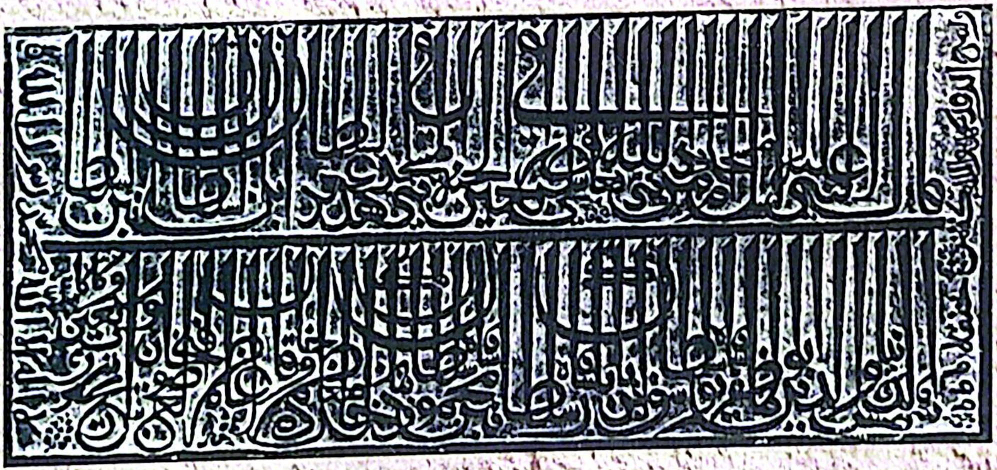

ইতিহাস একাডেমি ঢাকা
ITIHAS ACADEMY DHAKA

CamScanner